ভাববার কথা

জে. কৃষ্ণমূর্তি

কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া

ভাববার কথা
জে. কৃষ্ণমূর্তি ‘This matter of culture’ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ :
অঞ্জন পাহাড়ী

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১১

প্রকাশক :
কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (কলকাতা সেন্টার)
৩০, দেওদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
দূরভাষ (০৩৩) ৪০০৮-২৩৯৮
ই-মেল kfikolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট www.jkrishnamurti.org / kfionline.org

© কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া (চেন্নাই)

মুদ্রক :
শাল্মলী পাবলিকেশনস্
৫৭-বি টাউনসেন্ড রোড
কলকাতা - ৭০০ ০২৫

দাম :
একশত পঞ্চাশ টাকা

সূচিপত্র

১। শিক্ষার ভূমিকা ১

২। স্বাধীনতা ১২

৩। মুক্তি ও প্রেম ২২

৪। শোনা ৩৬

৫। সৃজনশীল অতৃপ্তি ৪৬

৬। জীবনের সমগ্রতা ৫৭

৭। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ৬৭

৮। সুসামঞ্জস্য ৭৮

৯। মুক্ত মন ৮৯

১০। অন্তরের সৌন্দর্য ৯৯

১১। বশ্যতা ও বিপ্লব ১১১

১২। অকপট প্রতীতি ১২৩

১৩। সমানতা ১৩৪

১৪। অনুশাসন ১৪৫

১৫। সহযোগিতা.. ১৫৬

১৬। মনের নবীভবন ১৭২

১৭। জীবনপ্রবাহ.. ১৮৫

১৮। মনোযোগ ১৯৮

১৯। জ্ঞান ও ঐতিহ্য ২১২

২০। ধর্মিষ্ঠ মনের উন্মুক্ততা ২২৬

২১। শেখা ২৩৮

২২। সহজ ভালোবাসা.. ২৫০

২৩। একাকীত্ব ও একত্ব.. ২৬৪

২৪। প্রাণশক্তি ২৭৮

২৫। সংগ্রামহীন জীবন ২৯১

২৬। মনের অতীত যে বিরাট ৩০৪

২৭। সত্যের খোঁজ ৩১৭

প্রশ্নসূচি ৩২৯

১

শিক্ষার ভূমিকা

আমি অবাক হয়ে ভাবি, সত্যি কি আমরা নিজেদের কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেছি— শিক্ষার অর্থ কী ? কেন আমরা স্কুলে যাই ? কেনই-বা আমরা বিভিন্ন বিষয় শিখি ? কেন একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করি এবং একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামি— আমাদের ঈপ্সিত একটু উচ্চমানের জন্য ? এই তথাকথিত শিক্ষার অর্থ কী ? শুধুমাত্র ছাত্রদের কাছেই নয়, পিতামাতাদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে এবং যাঁরা এই পৃথিবীকে ভালোবাসেন— তাদের সবার জন্য এটা কিন্তু খুবই জরুরী প্রশ্ন । শিক্ষিত হওয়ার জন্য কেন আমরা এই ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাই ? এটা কি শুধুমাত্র কয়েকটা পরীক্ষা পাশ করে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য ? নাকি আমরা যখন নবীন, তখন শিক্ষার কাজ হলো জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটা বোঝবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করা ? একটা চাকরি, একটা জীবিকা অবশ্যই জরুরী— কিন্তু সেটাই কি সব কিছু ? জীবন কিন্তু একটা চাকরি বা কোনো পেশায় প্রবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । জীবনের বিস্তার অনন্ত, এর গভীরতা অতল, অগাধ, এর রহস্য অসীম, আর এই অসীম ব্যাপ্তিতে আমরা মানবসত্তা হিসাবে ক্রিয়া করে চলেছি । তাই আমরা যদি শুধু জীবিকার জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করি তবে আমরা জীবনের মূল ব্যাপারটাকেই হারাবো । কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং গণিত, পদার্থবিদ্যা

বা অন্য কিছুতে দক্ষতা অর্জনের থেকেও জীবনকে বোঝা কিন্তু অনেক অনেক বেশী জরুরী।

সেইজন্যই, আমরা শিক্ষকই হই বা ছাত্রই হই, আমাদের নিজেদের কি প্রশ্ন করা জরুরী নয়— কেন আমরা অন্যদের শিক্ষিত করে তুলছি অথবা কেন শিক্ষিত হচ্ছি? এর সাথেই আর একটা প্রশ্ন— জীবনের অর্থই-বা কী? জীবন কি সত্যিই একটা অসাধারণ কিছু নয়? এই পাখী, ফুল, নতুন শাখায়-পাতায় সেজে ওঠা গাছ, এই অন্তহীন আকাশ, অগণিত নক্ষত্র আর এই বয়ে চলা নদী, তার মধ্যের মাছ— এইসব কিছুই জীবন। জীবন দারিদ্র, জীবন ঐশ্বর্যশালিতা, জীবন সম্প্রদায়ে, জাতিতে ও দেশের মধ্যের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, জীবন ধ্যান, জীবন ধর্ম, জীবন মনের গহনে লুকোনো অসংখ্য সূক্ষ্ম জিনিস— হিংসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আবেগ, ভয়, পরিপূর্ণতা, পরিতৃপ্তি আর উদ্বেগ। এইসব কিছুই জীবন এবং তার চেয়েও আরো অনেক বেশী কিছু। কিন্তু আমরা এর এক ক্ষুদ্র অংশকে বোঝার জন্য নিজেদের তৈরী করতে থাকি। আমরা বিশেষ কিছু পরীক্ষা পাশ করি। একটা চাকরি কোনোমতে খুঁজে নেই, বিবাহ করি, সন্তানের জন্ম দিই, আর তারপর আরো আরো বেশী যন্ত্রের মতো হয়ে যাই। আমরা জীবন সম্পর্কে ভীত, চিন্তান্বিত হয়ে থাকি। তাহলে এখন প্রশ্ন— শিক্ষার কাজ হলো জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়া ও তার প্রবাহটি বোঝবার জন্য আমাদের সহায়তা করা, নাকি আমাদের কোনো ব্যবসা বা কোনো চাকরির জন্য তৈরী করে দেওয়া?

তোমরা যখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষে বা নারীতে পরিণত হবে তখন তোমাদের সাথে কী ঘটবে? যখন তোমরা বড়ো হবে তখন তোমরা কী করবে— এ প্রশ্ন কি কোনোদিন নিজেদের জিজ্ঞাসা করেছো? স্বভাবতই বিবাহ করবে, কোথায়, কীভাবে আছো সেইসব কিছু বোঝবার আগেই বাবা-মা হয়ে যাবে; কোনো চাকুরি বা রান্নাঘরের চৌহদ্দিতে

বাঁধা পড়বে, আর সেখানেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে, নষ্ট হবে। এই কি সব— যা তোমাদের জীবনের সাথে ঘটবে? নিজেদের এ প্রশ্নগুলো করা কি উচিত নয়? যদি তোমরা সম্পন্ন পরিবার থেকে এসে থাকো, তবে তোমাদের প্রতিষ্ঠা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমাদের বাবারা হয়তো-বা একটি সুখের, আরামের চাকুরির ব্যবস্থা করে দেবেন, তোমরা হয়তো এক চমকদার বিবাহও করবে; তবু সেখানেও তোমরা ক্ষীণ হবে, জীর্ণ হবে, নষ্ট হবে।

অবশ্যই শিক্ষা যদি তোমাদেরকে— জীবনের বিরাট ব্যাপ্তি আর তার অগণন সূক্ষ্মতা, তার অপরিমেয় সৌন্দর্য, তার সকল দুঃখ আর আনন্দকে উপলব্ধি করতে সাহায্য না করে, তবে তার কোনো অর্থই নেই। হয়তো তোমরা কিছু ডিগ্রী অর্জন করলে, নামের শেষে অনেকগুলো শব্দ বসালে, ভালো চাকরিও হলো— কিন্তু তারপর? এইভাবে চলাতে তোমাদের মন যদি চিন্তাগ্রস্থ, স্থূল হয়ে ওঠে তবে এসবের অর্থ কী? ঠিক সেইজন্যই যখন তোমরা নবীন, তখন এ জীবন কী— তা খোঁজা কি সমীচীন নয়? যে মেধা, যে বোধ তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান করবে— তার উন্মেষ ঘটানোই কি শিক্ষার সত্য ভূমিকা নয়? তোমরা কি জানো এই মেধা কী? অবশ্যই এটা একটা শক্তি, এটা একটা সামর্থ্য, যাতে তোমরা ভয়শূন্য হয়ে কোনো সিদ্ধান্তকে ছাড়াই মুক্তভাবে চিন্তা করতে পারবে; ফলত তোমরা নিজেই— সত্য কী, বাস্তব কী— এই সবের খোঁজও করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমরা ভয়ের মধ্যে থাকো তবে কখনই সেই মেধা লাভ করতে পারবে না। যেকোনো ধরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা— সে আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হোক বা রোজকার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হোক তা উদ্বেগ আনে, ভয় আনে। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই একটা স্বচ্ছ, সরল, স্পষ্ট মন তথা মেধাসম্পন্ন মনের জন্ম দেয় না।

একটা কথা জেনো— যখন তোমরা নবীন, তখন এমন একটা

পরিবেশে থাকা খুবই জরুরী যেখানে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যত বয়ঃপ্রাপ্ত হতে থাকি, ততই ভয় পেতে থাকি। আমরা জীবনকে ভয় পাই, চাকরি হারাবার ভয় পাই, পরম্পরাকে ভয় পাই অথবা আমদের প্রতিবেশী, স্বামী বা স্ত্রী কে কী বলবে, কে কোনটা কীভাবে নেবে সেই ভয় পাই, আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। আমাদের অধিকাংশেরই কোনো-না-কোনোপ্রকারের ভয় আছে, আর যেখানে ভয় থাকে সেখানে মেধা থাকে না। এটা কি সম্ভব নয় যে আমাদের জীবনের প্রথম সময়টা, যখন আমরা নিতান্তই কিশোর, তখন এমন এক পরিবেশের মধ্যে থাকি যেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই; এক স্বাধীনতার, এক মুক্তির বাতাবরণ আছে— অবশ্য যা খুশী করার স্বাধীনতা নয় বরং জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে বোঝবার স্বাধীনতা রয়েছে? জীবন কিন্তু সত্যিই সুন্দর, আমরা একে যে শ্রীহীন বস্তুতে পরিণত করেছি, এটা কিন্তু তা নয়। এর অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য, এর অতল গভীরতা, এর অতুলনীয় সৌন্দর্যকে তখনই অনুভব করতে পারবে— যখন তোমরা সংগঠিত ধর্ম, পরম্পরা আর বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আর তখনই একজন মানুষ হিসাবে— সত্য কী, তুমি নিজেই খুঁজে পাবে। শিক্ষা কোনো কিছুকে অনুকরণ নয়, এটা একটা খোঁজ। যা সমাজ বা তোমাদের বাবা-মা বা তোমাদের শিক্ষকেরা বলেন— তার সাথে মানিয়ে নেওয়া, সেই অনুযায়ী চলা খুবই সহজ। এটা বেঁচে থাকার একটা সুরক্ষিত এবং সহজ পথ কিন্তু তা বেঁচে থাকা নয়, কারণ এর মধ্যে ভয় আছে, ক্ষয় আছে আর মৃত্যু আছে। জীবনে বেঁচে থাকা মানে নিজে খুঁজে বার করা— সত্য কী। আর সেটা সম্ভব যখন স্বাধীনতা থাকে, নিরন্তর অন্তরের বিপ্লব নিজের মধ্যে চলতে থাকে।

কিন্তু কেউ তোমাদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করে না। কেউ তোমাদের এসে বলে না— প্রশ্ন করো, নিজে খুঁজে বার করো ঈশ্বর কী; তার

কারণ তোমরা যদি বিদ্রোহ করো— এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে, এই খোঁজের মধ্যে দিয়ে— যেসব জিনিস অসত্য তোমরা তাদের কাছে এক বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের বাবা-মা বা সমাজ চায় তোমরা সুরক্ষিতভাবে, নিরুপদ্রবে বেঁচে থাকো এবং তোমরাও তাই চাও। এই সুরক্ষিতভাবে বেঁচে থাকা মানে বোঝায় অনুকরণ করে বেঁচে থাকা, ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা। তাই শিক্ষার প্রধানতম ভূমিকা হলো আমাদের মুক্তভাবে, নির্ভয়ে বেঁচে থাকবার জন্য সহায়তা করা— তাই নয় কি ? যেখানে ভয়ের চিহ্ন নেই এমন এক পরিবেশ তৈরী করার জন্য তোমাদের এবং শিক্ষকদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

যেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই এমন কোনো পরিবেশ কতটা অসাধারণ ব্যাপার তোমরা কি তা জানো ? আমাদের এমন এক বাতাবরণ আনতেই হবে— কারণ সারা পৃথিবীতে আজ অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলছে। যাঁরা রাজনীতিবিদ বা ক্ষমতালোভী, তাঁদের দ্বারা এই পৃথিবী পরিচালিত। এটা পুলিশ, মিলিটারী, উকিল আর অসংখ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের পৃথিবী। এঁরা সবাই উঁচুতে উঠতে চাইছেন এবং নিজেরাই নিজেদের মারছেন। এছাড়া তথাকথিত মহাত্মা, ধর্মীয় গুরুরা রয়েছেন, আর আছে তাঁদের ভক্তের দল, তাঁরাও হয় এ জীবনে না হয় পরের জীবনে ক্ষমতা চান অথবা উচ্চাসন চান। এ এক অদ্ভুত উন্মত্ত পৃথিবী, সীমাহীন সংশয়ে দিশাহারা— একদিকে সাম্যবাদীরা লড়াই করছে পুঁজিবাদীদের সাথে, আবার সমাজবাদীরা দুজনকেই বাধা দিচ্ছে— এখানে সবাই সবার বিরুদ্ধে লড়ছে, সবাই সবার আগে কোনো এক সুরক্ষিত জায়গায়, ক্ষমতায় অথবা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছোতে চাইছে। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসের, জাতির, সম্প্রদায়ের, শ্রেণী বিভাগের, পৃথক রাষ্ট্রের— সবরকম স্থূলতা আর নিষ্ঠুরতার আঘাতে-আঘাতে পৃথিবী আজ দীর্ণ। আর এমনই এক পৃথিবীতে— মানিয়ে চলার জন্য, বেঁচে থাকবার জন্যই তোমাদের শিক্ষিত করা হচ্ছে।

এমনই এক বিধ্বংসী সমাজের কাঠামোর সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই তোমাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তোমাদের বাবা-মায়েরাও চান তোমরা মানিয়ে নাও, আর তোমরাও তাই চাও।

এখন কথা হলো, শিক্ষার কাজ কি এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কাঠামোর সাথে তোমরা যাতে মিলিয়ে চলতে পারো তাতে সাহায্য করা, নাকি তোমাদের স্বাধীন করা, সম্পূর্ণ মুক্ত করা, যাতে তোমরা এক ভিন্ন সমাজ গড়তে পারো, এক নতুন পৃথিবী গড়তে পারো? আমরা কিন্তু এই স্বাধীনতা ভবিষ্যতে নয় এখনই চাই— তা না হলে আমরা সকলেই হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারি। এই মুহূর্তেই আমাদের স্বাধীনতার তথা মুক্তির এক বাতাবরণ গড়তে হবে— যাতে তোমরা বাঁচতে বাড়তে পারো, সত্য কী— তা নিজেরা খুঁজতে পারো, মেধাসম্পন্ন হতে পারো, এবং পৃথিবীর সাথে নিজেদের মানিয়ে না নিয়ে তার সম্মুখীন হয়ে তার সমগ্র ধারাটিকে উপলব্ধি করতে পারো। এরফলে তোমাদের সত্তার অন্তরতম প্রদেশেও এক গভীর বিপ্লব নিরন্তর চলতে থাকবে এবং যার মধ্যে এই গভীর আন্তরিক বিপ্লব চলে সে-ই খুঁজে পায় সত্য কী। যে এই পরম্পরাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছে, তাকে মানিয়ে নিয়ে চলছে তার পক্ষে কোনোদিনই তা সম্ভব হয় না। যখন তোমাদের মধ্যে অবিশ্রাম অন্বেষণ, বিরামহীন পর্যবেক্ষণ আর নিরন্তর শিখে চলা থাকবে তখনই তোমরা সত্য কী, ঈশ্বর কী, প্রেম কী— তা উপলব্ধি করবে। কিন্তু ভয় থাকলে— সেই তীব্র অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ, শিখে চলা আর গভীর সচেতনতা থাকে না। সুতরাং শিক্ষার ভূমিকা হলো বাহিরে এবং ভিতরে সকল ভয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, কারণ এই ভয় মানুষের চিন্তাকে, সম্পর্ককে আর প্রেমকে নষ্ট করে।

প্রশ্নকারী : *যদি সবাই বিদ্রোহ করে তবে কি পৃথিবীতে এক অরাজকতার সৃষ্টি হবে না?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ প্রশ্নটাকে শোনো। কেবল একটা তৈরী উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, প্রশ্নটাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়। প্রশ্নটা হল— যদি সব ব্যক্তি বিদ্রোহ করে তবে কি পৃথিবীতে এক অরাজকতার সৃষ্টি হবে না? কিন্তু বর্তমানে যে সমাজ রয়েছে তা-কি সুবিন্যস্ত, সুব্যবস্থিত। তাই, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে বিপ্লব করে তাহলে সেটা অব্যবস্থিত, অবিন্যস্ত হয়ে যাবে? এখনই কি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা নেই? সব কিছুই এতে কি সুন্দর, অবিকৃত, বিশুদ্ধ? প্রত্যেকে কি আনন্দে, সমৃদ্ধিতে, আর পূর্ণতায় বেঁচে আছে? এখানে একজন কি আর একজনের বিরুদ্ধে নয়? এখানে কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার বিষাক্ত বাতাবরণ নেই। এখন পৃথিবী যে অবস্থায় আছে তা বিশৃঙ্খলা— সেটাকে প্রথমে বুঝতে হবে। এটাকে একটা সুবিন্যস্ত, সুচারুরূপে পরিচালিত সমাজ বলে ধরে নিও না। কিছু ভালো-ভালো কথায় মোহিত হয়ে যেও না। এই দেশ বা ইউরোপ, আমেরিকা বা রাশিয়া— সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর যদি তুমি এই ক্ষয়কে দেখতে পাও— তখনই সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটা হলো এই আশু সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা। কীভাবে তোমরা এই সমস্যার মুখোমুখি হও, এতে সাড়া দাও, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, তাই নয় কি? যদি তোমরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান বা কম্যুনিস্ট হিসাবে সাড়া দাও তবে তা কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ ব্যাপার হবে— বলতে পারো এটা কোনো সাড়া দেওয়াই নয়। যখন তোমাদের মধ্যে কোনো ভয় থাকবে না, যখন একজন হিন্দু বা সাম্যবাদী বা পুঁজিবাদী হিসাবে নয়, একজন পূর্ণ মানবসত্তা হিসাবে এই সমস্যার সমাধান খুঁজবে— তখনই তোমরা এই চ্যালেঞ্জে পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারবে। আর যতক্ষণ তোমরা এই সমগ্র জিনিসটার বিরুদ্ধে— এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এই গৃধ্নুতা— যার উপর ভিত্তি করে এ সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করবে, ততক্ষণ এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। যখন তোমরা নিজেরা

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নও, কোনো কিছু অর্জন করার জন্য লোলুপ নও, যখন নিজের নিরাপত্তাটাই তোমাদের কাছে প্রথম এবং শেষ কথা নয়— তখনই তোমরা এই চ্যালেঞ্জের প্রতি পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারবে, তখনই তোমরা এক নতুন বিশ্ব গড়তে পারবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ *বিপ্লব, শেখা আর প্রেম— এরা কি পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া, নাকি এরা একইসাথে ক্রিয়া করে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ অবশ্যই এরা তিনটি পৃথক প্রক্রিয়া নয়। এটা একক প্রক্রিয়া। আসলে প্রশ্নটার অর্থ কী সেটা বোঝা খুব জরুরী। প্রশ্নটা আসলে একটা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে করা, এটা কোনো উপলব্ধি থেকে আসা প্রশ্ন নয়। সেইজন্যই এটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন। তাই এর কোনো সত্যমূল্য নেই। যে নির্ভয়, যার মধ্যে সেই বিপ্লবের লেলিহান শিখা জ্বলছে, যে শেখা কী, প্রেম কী জানবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করছে, অবিশ্রান্তভাবে খুঁজছে, সে কখনো জিজ্ঞাসা করে না— এটা একটা প্রক্রিয়া, না তিনটে পৃথক প্রক্রিয়া। আমরা শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারে অতি চতুর; আমরা ভাবি সমস্যার ব্যাখ্যা করে আমরা সমস্যাটারই সমাধান করে ফেলেছি।

তোমরা কি জানো— শেখার অর্থ কী? যখন তোমরা সত্যকার শিখছো তখন সারাজীবন ধরেই তোমরা শিখে চলো। এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে কোনো বিশেষ একজন শিক্ষকের থেকে তোমরা শিখছো। তখন একটা ঝরা পাতা, পাখীর উড়ে যাওয়া, ভেসে আসা কোনো গন্ধ, এক ফোঁটা চোখের জল, ধনী ও দরিদ্র— যারা কোলাহল করছে, কোনো স্ত্রীলোকের হাসি অথবা কারোর অহংকার, ঔদ্ধত্য— এইসব কিছুই তোমাদের শেখায়। তোমরা সকল কিছু থেকে শেখো; তাই আলাদা করে কোনো দিশারি, কোনো দার্শনিক, কোনো গুরুর প্রয়োজন হয় না। তখন জীবন নিজেই তোমাদের দিশারি আর তোমরাও নিরন্তর শিখে চলো।

প্রশ্নকর্তা ঃ *সমাজ, কিছু অর্জনের লোলুপতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তা ঠিক, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি আমাদের ক্ষয় বন্ধ হয়ে যাবে?*

কৃষ্ণমূর্তি ঃ এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এটার জন্য আমাদের প্রয়োজন গভীর মনোযোগ।

তোমারা কি এই গভীর মনোযোগ দেওয়ার অর্থ জানো। আচ্ছা একসাথে ব্যাপারটা দেখা যাক। ক্লাসের মধ্যে বসে যখন তোমরা জানালা দিয়ে বাহিরে তাকাও অথবা কোনো সহপাঠীর চুল টেনে দাও, তখন শিক্ষক মহাশয় বলেন মনোযোগ দিতে। এর অর্থ কী? অর্থাৎ তোমরা যেটা পড়ছো সেটা তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়, তাতে তোমাদের আগ্রহ নেই, তখন শিক্ষক জোর করে মনোযোগ দিতে বাধ্য করেন— যেটা আসলে কোনো মনোযোগই নয়। যখন কোনো বিষয়ে তোমাদের গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ থাকে তখনই মনোযোগ আসে। তখন তোমাদের সমস্ত মন, সমগ্র সত্তাই সেখানে উপস্থিত আর তোমরাও ঐ বিষয়ের ব্যাপারে যাবতীয় কিছু জানতে চাও। ঠিক সেইভাবেই, যে মুহূর্তে উপলব্ধি করো— যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলেই কি আমাদের ক্ষয় থাকবে না— এই প্রশ্নটা সত্যি অতি গুরুত্বপূর্ণ, তখন এর সত্যতা জানবার তীব্র অনুসন্ধিৎসা তোমাদের মধ্যে দেখা দেয়।

এখন কথা হলো একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ কি নিজেকেই নিজে নষ্ট করে না? এটাকেই প্রথম খুঁজে বার করতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঠিক না ভুল সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। নিজেদের চারিদিকে একটু লক্ষ্য করো। যে সব লোকেরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাদের লক্ষ্য করো। তোমরা যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তখন কী ঘটে? তখন তোমরা তোমাদের নিজের সম্বন্ধেই ভেবে চলেছো, নিজের চাওয়াটাকে পূর্ণ করতে গিয়ে, নিজে বড় কিছু হতে গিয়ে নিষ্ঠুরতার সাথে, ক্রূরতার সাথে অন্যকে সরিয়ে

দিচ্ছ। এইভাবেই সমাজে— যারা সফলতার দিকে এগোচ্ছে আর যারা অসফল হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে তাদের উভয়ের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। তোমরা যেটা চাও আর তোমাদেরই সাথে আরো যারা ঐ একই জিনিস চায়— তাদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে। এখন প্রশ্ন— এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি কোনো সৃজনশীল জীবনের জন্ম দেয়? প্রশ্নটা কি খুব শক্ত হলো?

যখন তোমরা কোনো কিছুকে ভালোবাসো আর সেটার জন্যই সেটা করতে চাও— তখন কি তোমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী? কোনো লক্ষ্যে পৌঁছোবে বলে নয়, আরো কিছু লাভ আসবে বলে নয়, বিশেষ পরিণামের আশা করেও নয়, কেবল জিনিসটাকে ভালোবাসো বলেই মনপ্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে যখন সেটা করো তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাই নয় কি? সেখানে প্রথম স্থান অধিকারের জন্য কারো সাথে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। সত্যকার তোমরা কী করতে ভালোবাসো, এবং জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমরা এমন কিছু করো— যা তোমাদের কাছে মূল্যবান, যা তোমাদের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ— সেটা খুঁজে বের করাতে সহায়তা করাই কি শিক্ষার ভূমিকা নয়? নাহলে তোমাদের জীবনের বাকী দিনগুলো নৈরাশ্যের নিরালোকে হারিয়ে যাবে। কী করতে ভালো লাগে, না জানলে, মন এক অভ্যস্ত জীবনের জালে আটকা পড়বে। সেখানে বৈচিত্র্যহীনতার ক্লান্তি, ক্ষয় আর মৃত্যু ছাড়া কিছুই নেই। তাই জীবনের প্রত্যুষেই তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে, সত্যই তোমরা কী করতে ভালেবাসো, কোন কাজের প্রতি তোমাদের সত্যঅনুরাগ রয়েছে, আর এটাই নতুন সমাজ গড়ার একমাত্র পথ।

প্রশ্নকারী ঃ *অন্যান্য বেশীর ভাগ দেশের মতো ভারতেও শিক্ষা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমতাবস্থায় আপনার আলোচিত বিষয়গুলোর পরীক্ষা-*

নিরীক্ষা কি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব?

কৃষ্ণমূর্তি ঃ যদি সরকারের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে এমন ধরণের স্কুল কি চলতে পারে? এটাই প্রশ্ন। যিনি প্রশ্নটা করলেন, তিনি দেখেন সারা পৃথিবী আরো-আরো বেশী করে সরকার দ্বারা, রাজনীতিবিদ দ্বারা, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁরা আমাদের মনকে, আমাদের হৃদয়কে একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলতে চাইছেন। তাঁরা চান আমরা এক বিশেষ ধরণের চিন্তাভাবনাই করি। রাশিয়া বা অন্য যেকোনো দেশেই সরকার দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। এখন কথা হচ্ছে আমি যে ধরণের স্কুল বা শিক্ষার কথা বলছি— সরকারের সাহায্য ছাড়া তার অস্তিত্ব সম্ভব কি না।

যদি আপনারা কোনো জিনিসকে সত্যি প্রয়োজনীয় মনে করেন, যদি সত্যিই তাকে মূল্যবান মনে করেন এবং তাতে নিজেদের সমগ্র হৃদয় ঢেলে দেন— তাহলে সমাজ বা সরকারের স্বীকৃতি বা সহায়তা থাকুক বা না থাকুক, সেটা ফলবান হবেই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশই আমাদের হৃদয়, আমাদের মনপ্রাণ একসাথে কোনো কিছুতে ঢেলে দিই না আর তাই আমরা এমনতরো প্রশ্ন করি। যখন আপনি এবং আমি সত্যকার ভাবি যে এক নতুন পৃথিবী গড়া সম্ভব, যখন আমাদের মধ্যে মানসিক ও অ্যাধ্যাত্মিক বিপ্লব নিরন্তর চলতে থাকে— কেবল তখনই আমরা আমাদের হৃদয়, মন, আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে এমন বিদ্যালয়ের নির্মাণ করি— যেখানে ভয়ের চিহ্নমাত্র থাকে না।

আসলে সত্যকার বিপ্লবাত্মক কিছু কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারাই সৃষ্টি হয়। তাঁরা দেখেন সত্য কী এবং তারই আলোতে তাঁরা বাঁচেন। কিন্তু সেই সত্যের সন্ধান পেতে গেলে আপনাদের সকল পরম্পরা, সকল অতীত থেকে মুক্ত হতে হবে, আর এর অর্থ হলো সকল ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে।